প্রথম আলো

তারিখ ... 15 JAN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাওয়া শিক্ষা খাতে দুর্নীতি কমানোসহ নানা চ্যালেঞ্জ

শরিফুজ্জামান পিন্টু ●

শিক্ষা

শিক্ষায় বরাদ্দ সর্বোচ্চ, দুর্নীতির পরিমাণও সবচেয়ে বেশি। গত প্রায় দেড় দশকে এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তাই শিক্ষায় দুর্নীতি কমানো রাজনৈতিক সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন ওই খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনেই শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষা খাতের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষা খাতে কোনো রকম অনিয়ম ও দুর্নীতি সহ্য করা হবে না। নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী শিক্ষা খাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও বলেছেন তিনি।

দেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৬ শতাংশ ছাত্র। এ হিসাবে শিক্ষার্থী রয়েছে প্রায় তিন কোটি ৩৩ লাখ। এ বিপুল জনশক্তিকে সম্পদে পরিণত করতে হলে শিক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে বলেই সবাই মনে করেন।

শিক্ষক ও ছাত্র অনুপাতে ভারসাম্য : দেশের ৪০ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক অনুপাতে ছাত্র কম, বাকি ৬০ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক অনুপাতে ছাত্র বেশি। আশির দশকের শেষভাগ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়নি। ফলে একই থানায় ১৮টি কলেজ গড়ে ওঠার মতো ঘটনাও ঘটেছে।

জানা যায়, অধিকাংশ কলেজেই শিক্ষক অনুপাতে ছাত্র নেই। জোট সরকারের প্রথম দিকে পরিচালিত এক জরিপে বলা হয়েছিল, দেশে নিম্নমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। সেই অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। উল্লেখ্য, দেশে এখন বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩০ হাজারেরও বেশি।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাসচিব মো. মোমতাজুল ইসলাম বলেন, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলোর মধ্যে ভারসাম্য আনা জরুরি হলেও কাজটি বেশ কঠিন। বেসরকারি শিক্ষকদের বদলির নিয়ম চালু করলে শিক্ষক ও ছাত্র অনুপাতে সামঞ্জস্য আনা যেতে পারে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

ঝুলে আছে এমপিও : প্রায় পাঁচ বছর ধরে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি (বেতনের সরকারি অংশ) বন্ধ রাখা হয়েছে। অথচ এমপিওভুক্তির

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাওয়া শিক্ষা খাতে দুর্নীতি কমানোসহ নানা চ্যালেঞ্জ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জন্য শর্ত পূরণ করা অসংখ্য স্কুল, কলেজ রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, একাডেমিক স্বীকৃতি নিয়ে এমপিওর জন্য অপেক্ষা করা বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। এসব প্রতিষ্ঠান এমপিও করতেই হবে এবং সে ক্ষেত্রে বছরে বেতন-ভাতা খাতে অতিরিক্ত খরচ হবে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। এ ছাড়া পাঠদানের অনুমতি পাওয়া এবং একাডেমিক স্বীকৃতি ও পাঠদানের অনুমতির জন্য আবেদন করা কয়েক হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, দুর্নীতি ও অনিয়মের ঊর্ধ্বে উঠে প্রতিষ্ঠান কাজই করা রাজনৈতিক সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে।

জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও বৈষম্য রোধে সর্বাগ্রে কাজ শুরু করা উচিত। তিনি বলেন, "আমরা সবাই জানি, কীভাবে এত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। এ জন্য তো আর শিক্ষক দায়ী নন। কিন্তু কারা, কীভাবে এসব প্রতিষ্ঠান গড়ার পেছনে কাজ করেছেন, তাঁদের কথা জাতি জানতে চায়।"

মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ : দেশের প্রায় ৯ শতাংশ ছাত্রছাত্রী মাদ্রাসায় পড়াশোনা করলেও ওই শিক্ষার সনদপ্রাপ্তরা প্রতিযোগিতার উপযোগী হিসেবে গড়ে উঠছে না। এ পর্যন্ত প্রায় সব সরকারই মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের কথা বললেও সেই অর্থে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের কথা যাঁরা বলছেন, তাঁদের অনেকেই চান না মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা জীবনের পেছনে পড়ে আলোকিত মানুষ হোক। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছে, "মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলা হবে।"

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের অন্যতম সমন্বয়কারী অধ্যাপক এম এ বারী বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে এ যাবৎ কথা অনেক হয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তিনি মনে করেন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে মূল ধারায় আনা ও আধুনিকীকরণসহ এ শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন দরকার।

নকল কমেছে, ধরে রাখা জরুরি : জোট সরকারের মেয়াদে শিক্ষায় সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল নকল কমে আসা। সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনের নেতৃত্বে নকলবিরোধী অভিযান নিয়ে কিছু বিতর্ক হলেও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় নকল অনেক কমেছে। সেই ধারাবাহিকতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ও বজায় ছিল। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সভাপতি অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান এ প্রসঙ্গে বলেন, নকলমুক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা কোনো ব্যক্তিগত বা দলীয় বিষয় নয়। শিক্ষাঙ্গন নকলমুক্ত রাখতে বর্তমান সরকারকে আরও কঠোর হতে হবে।

পাঠ্যবই : পাঠ্যবই নিয়ে মাঝেমধ্যে সংকট তৈরি হচ্ছে এবং একটি সিন্ডিকেটের কাছে সরকার ও শিক্ষার্থী-অভিভাবকেরা জিম্মি হয়ে পড়ছে। আর নোট-গাইড ও সহায়ক বই নিয়ে লুটপাট লেগেই আছে। ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে বই নিয়ে ব্যাপক হইচই হয়। প্রায় সাত বছর পর ক্ষমতা নিয়েই বই সংকট মোকাবিলার দায়িত্ব এসেছে আওয়ামী লীগ সরকারের ওপর।

পাঠ্যবই-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রাথমিকের মতো মাধ্যমিকের বই বিনামূল্যে দেওয়া যেতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ বিষয়টি অনুমোদন করে গেছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মফিজ উদ্দিন এ প্রসঙ্গে বলেন, প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি স্তরের মতো মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে বই দেওয়া হলে ঝরে পড়ার হার কমবে, দরিদ্র শিক্ষার্থী উপকৃত হবে এবং সর্বোপরি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবি জিম্মি অবস্থা থেকে রক্ষা পাবে।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহসভাপতি কামরুল হাসান শায়ক বলেন, বিনামূল্যের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে বই প্রকাশের সুযোগ অবারিত করলে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মানসম্পন্ন বই বাজারে আসবে, শিক্ষার মানও বাড়বে।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী মো. সেলিম ভূঁইয়া বলেন, নতুন সরকারের প্রথম দায়িত্ব শিক্ষার্থীর জন্য বই নিশ্চিত করা।

জাতীয় শিক্ষানীতি : গত দুটি সরকারের মেয়াদে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হলেও তা কার্যকর হয়নি। এর আগেও কয়েকটি শিক্ষানীতি হয়েছে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের কথা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, শিক্ষানীতির কাঠামো তৈরি করা আছে। এখন বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে ওই নীতি আরও যুগোপযোগী করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, সবার মত নিয়ে একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করা উচিত। এর ফলে ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষানীতি করলেও সন্দেহ-সংশয় দূর হবে।

নিরক্ষরতা দূর করা : আওয়ামী লীগ সরকার ২০০০ সালের মধ্যে দেশ নিরক্ষরমুক্ত করার কথা বলেছিল। সে লক্ষ্যে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন শুরু করলেও তা সফল হয়নি। বরং প্রায় ৭০০ কোটি টাকা অপচয় হয়েছে। এবারের নির্বাচনী ইশতেহারে ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নিট ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত করা এবং ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

দেশ নিরক্ষরমুক্ত করা, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার কমানোসহ বিভিন্ন লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রকল্প হয়েছে। এগুলোর বেশির ভাগই ব্যর্থ হয়েছে। কিছু অগ্রগতি হলেও টাকার হিসাবে সুফল যথেষ্ট নয়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২০০৪ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর বন্ধ ঘোষণা করে বলেছিলেন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পেছনে যত টাকা ব্যয় হয়েছে, কাজের কাজ সেই তুলনায় কিছুই হয়নি। এ মুহূর্তে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে। ওই কর্মসূচি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারবে না—এমন সংশয় প্রকাশ করেছে কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা। এ বিপুল টাকার সদ্ব্যবহার করে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানো উচিত বলে মনে করেন শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

শিক্ষার শেষ দুটি অধ্যাদেশ : শিক্ষা খাতে বর্তমান সরকারের আশু করণীয় প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ওই খাত-সংশ্লিষ্ট কয়েকজন বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদের শেষভাগে শিক্ষায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। এর একটি হচ্ছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটি অধ্যাদেশ প্রণয়ন। ওই দুটি অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করে তা কার্যকরের উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন তাঁরা। শিক্ষক নেতা মো. সেলিম ভূঁইয়া বলেছেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটি-সংক্রান্ত অধ্যাদেশটি কার্যকর হলে শিক্ষকেরা মর্যাদার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

শিক্ষায় অগ্রাধিকারমূলক কাজ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রথম আলোকে বল... শিক্ষা একটি চলমান বিষয় এবং ... সংকট ও সমস্যার মধ্যেও এটা চ... এ শিক্ষাব্যবস্থাকে কীভাবে আরও ... ও গতিশীল করা যায়, সেই চেষ্টা ক... হবে।